সার্ধশতবর্ষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়*

সৌম্যজিৎ রায়

১৮৯০ সালের শীতকাল। প্রেসিডেন্সী কলেজ। রসায়ণের ক্লাস নিতে আসবেন এক নতুন নামী বিলেত-ফেরত অধ্যাপক। ক্লাসে একটা খোপ খোপ গলা-বন্ধ কোট পরে ঢুকলো বেয়ারা। বোর্ড মুছে বেরিয়ে যেতেই সেই একই রকম কোট পরে ক্লাসে ঢুকলেন সেই বিলেত-ফেরত অধ্যাপক। অনেকের মতই সেদিন প্রথমবারের মত বেশ অবাকই হন সেই অধ্যাপকের ছাত্র চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজর ডেমনস্ট্রেটারের কাছে জানতে পারেন চারুবাবু যে একটা থান থেকে চারটে কোট কাটাতেন সেই প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ণের অধ্যাপক। দুটো রাখতেন নিজের জন্য আর দুটো দিতেন বেয়ারাকে। কে সেই অধ্যাপক? তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

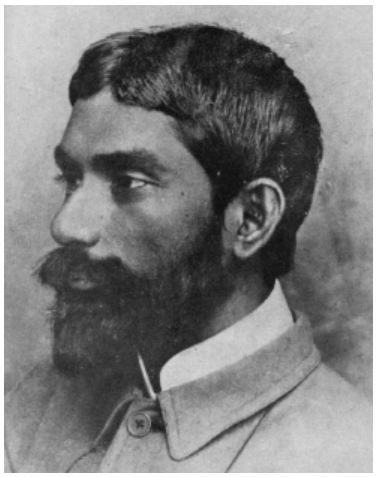

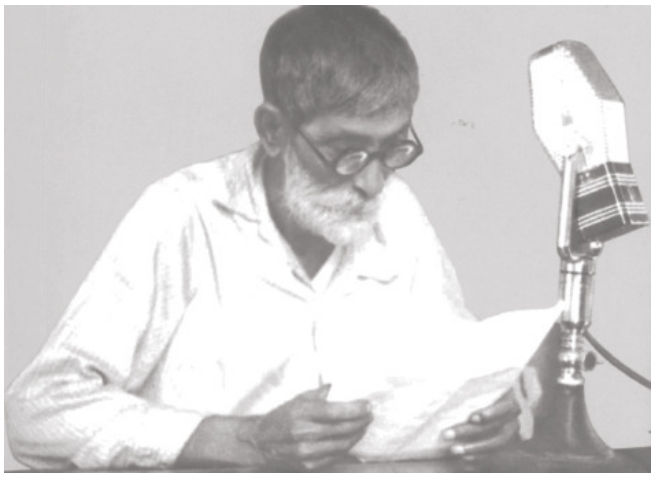

যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বে আচার্য।

জন্ম ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট, আজকের বাঙলাদেশের খুলনা জেলার রারুলী-কাটিপাড়া গ্রামে। মা ভুবনমোহিনী দেবী। বাবা হরিশচন্দ্র রায়। হরিশচন্দ্রের যাতায়াত তখন বাঙলার চিন্তাবিদের ঘরে। ঘরে ভিড় করেছেন দেশ-বিদেশের নানান নামী দামী লেখকরা, তাঁদের বইয়ে, হরিশচন্দ্রের লাইব্রেরীতে। সেই পথে আনাগোনা ছোট থেকেই শিশু প্রফুল্লচন্দ্রের। হরিশচন্দ্রের ইংরিজি, ফার্সী ছাড়াও কাজ-চালানোর মত জ্ঞান ছিল

আরবী, সংস্কৃতে। মুক্তমনা হরিশচন্দ্রকে লোকে বলতো ম্লেচ্ছ। বাবার মুক্তমন, সাহিত্যানুরাগ, মায়ের মমতাময়ী মনের সহজ উত্তরাধিকার প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে। ১৮৭০ সালে প্রফুল্লচন্দ্রের কলকাতায় আসা ও হেয়ার স্কুলে ভর্তি হওয়া। তারপর অত্যধিক অধ্যবসায়ে অসুস্থ হয়ে ১৮৭৪ এ তাঁর দেশের বাড়ী ফেরা। এরপর বাড়ীর গ্রন্থাগারের মুক্ত আহ্বানে একরাশ দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে মিশে যাওয়া। ঐটি বোধহয় তাঁর জীবনের এক সুন্দর সূচনার অধ্যায়। তাঁর নিজের কথায়, “Freed from the routine studies of dry school textbooks, I got the opportunity of studying as per my own will and interest.” অবশেষে ১৮৭৬ সালে কলকাতায় ফিরে আসা এবং অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হওয়া। ১৮৭৯ সালে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হয়ে মেট্রোপলিটন বা আজকের বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হয়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর সান্নিধ্যে আসা। রসায়ণ পাঠ বাধ্যতামুলক হলেও সে সময় বিদ্যাসাগর কলেজে রসায়ণ না থাকায় প্রফুল্লচন্দ্রের প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়ণ পড়তে আসা আর অধ্যাপক অ্যালেকসান্ডার পেডলারের সান্নিধ্যে ও তাঁর পড়ানোয় উদ্বুদ্ধ হয়ে রসায়ণের প্রতি এক গভীর অনুরাগে আকৃষ্ট হওয়া। আর সেই শুরু তারপর যেমন কথায় আছে, বাকীটা ইতিহাস। এফ এ পাশ করে গিলক্রিস্ট বৃত্তি নিয়ে এডিনবরা পারি। ১৮৮৭ সালে পড়াশুনা ও অ্যালেকসান্ডার কাম ব্রাউনের সঙ্গে গবেষণা কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করে ডি-এস-সি পদবী অর্জন, সঙ্গে অসাধারণ গবেষণা, পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ণ সমিতির সহ-সভাপতিত্ব অর্জন, তাঁর জনপ্রিয়তার নিদর্শন। কপার-ম্যাগনেশিয়াম সালফেটের ডাবল সল্টের ওপর থিসিসের জন্য হোপ পুরস্কার পেয়ে দেশে ফেরা।

পড়াশুনোর পাশাপাশি চলত সাহিত্যচর্চা। এ সময়ে তাঁর লেখা ভারতবর্ষের ওপর দুটো বইয়ের নাম “India before and after mutiny”, ”Essays on India”, বিশেষভাবে উল্লেখ্য। “India before and after mutiny” বইটার প্রেক্ষাপট বেশ উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৫ সাল। এডিবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোর্ট বিষয়ের ওপর লেখা সেরা প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিযোগিতায় অংশ নেন

এবং তাঁর প্রবন্ধে নিঁখুত ব্যবচ্ছেদে দেখান কিভাবে বৃটিশ শাসনে ভারতের সমগ্রিক উন্নয়ন আর শিক্ষা অবহেলিত, উপেক্ষিত। প্রত্যাশিতভাবেই তাঁর লেখা পুরস্কৃত না হলেও তাঁর গবেষণামূলক, পরিশীলিত লেখনী প্রতিযোগিতায় পেল বিশেষ উল্লেখ। এখানে থেমে না থেকে প্রফুল্লচন্দ্র বৃটেনের উদারমনস্ক সাংসদ জন ব্রাইটকে তাঁর লেখাটি পাঠালে ব্রাইট লেখার ভূয়সী প্রশংসা করে লেখাটির প্রচারের উপদেশ দেন। সময় নষ্ট না করে প্রফুল্লচন্দ্র লেখাটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাঠিয়ে সাড়া ফেলে দেন।

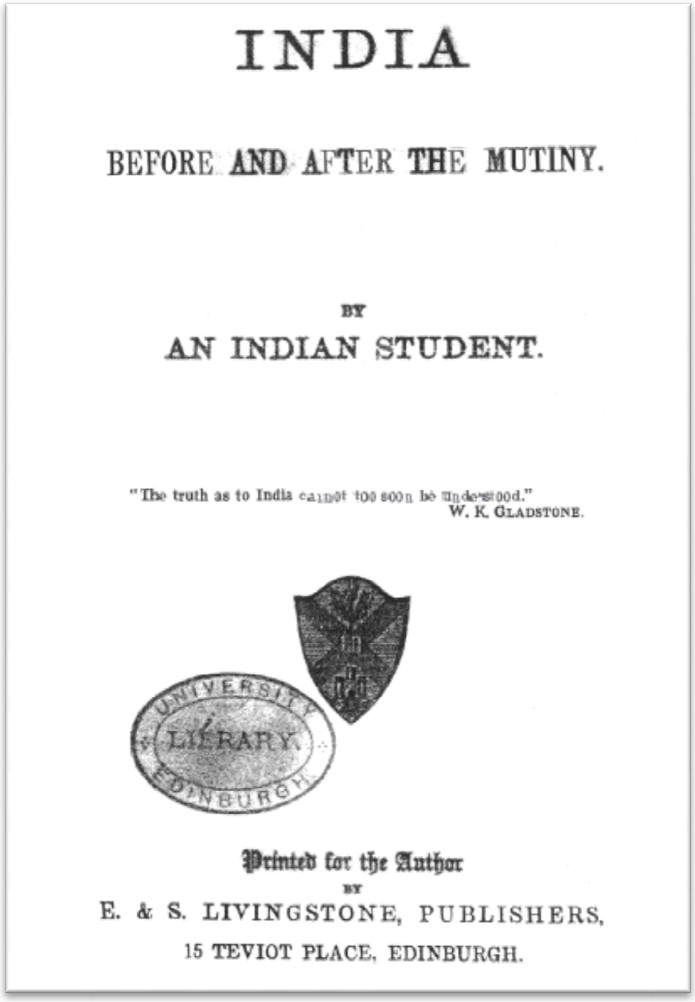

INDIA

BEFORE AND AFTER THE MUTINY.

BY

AN INDIAN STUDENT.

"The truth as to India cannot too soon be understood."
W. K. GLADSTONE.

UNIVERSITY LIBRARY EDINBURGH

Printed for the Author
BY
E. & S. LIVINGSTONE, PUBLISHERS,
15 TEVIOT PLACE, EDINBURGH.

Govt. Science Record of Dr. P. C. Ray
Taken from the Histor of Services of Gazetted and other officers serving under the Government of Bengal.
(Corrected up to 1st July 1916, Pt. II, 1916.)
Ray, Dr. Prafullay Chandra, D.Sc. (Edinburgh) C.I.E..., Born August 1961—Joined the service, 24th June 1889 (Dy. G. B. 4185, dated 1st December 1904).

Station	Substantive Appointment	Officiating Date Appointment Date
Calcutta	Asstt. Prof. of Chemistry, Presy. College 24.6.1889	
"	Class IV of Provl. Ednl. Service,	1. 8. 1896
"	Class III "	8.12.1900
"	Class II "	20.4.1902
	Subsidiary leave for 2nd August, 1904	
Furlough for 7 months and 28 days from 3rd August, 1904, during which he was on deputation in England from 7th September. 1904 to 6th March. 1905		
(on leave)	Class I, "	1. 2. 1905
	Subsidiary leave from 31st March, 1905	
Calcutta	Ditto and Prof. Presidency College	3. 4. 1905
"	"	I.E.S. 10.4.1906
"	"	17.1.1910
"	"	I.E.S. 23.2.1911

Leave on private affairs for 1 month and 10 days, from 30th June 1912, combined with the college vacation.
The provisions of Articles 233 (IV) and 337, Civil Service Regulations, were relaxed and the leave on private affairs should not be held to interrupt Dr. Roy's service for future furlough. (Vide S. of S's telegram, dated 27th June 1912–Dy. G.I., 222 dated 1.7.12).

	Subsidiary leave from 9th August 1912	
Ditto	Ditto	12 Aug. 1912

Literary Work :—The Sulphates of the Copper and Magnesium Group, Hindu Chemistry.

আচার্যের সার্ভিস রেকর্ড।

দেশে ফিরে আসে স্বপ্নভঙ্গ। কারণ বৃটিশ সময়। তখন দুধরণের চাকরী বিজ্ঞানীদের। কম বেতন ও সুযোগের প্রভিন্সিয়াল চাকরী ছিল মূলতঃ দেশের সাধারণ মানুষের জন্য। আর বেশী বেতন ও সুযোগের ইম্পিরিয়াল চাকরী ছিল ইয়োরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত। তাই ইংরেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ স্তরের ডিগ্রী ও গবেষণার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে পেলেন না ইম্পিরিয়াল চাকরী। এক বছর অপেক্ষা

করে বাস্তবকে মেনে নিয়ে শেষে ১৮৮৯ সালে প্রভিন্সিয়াল চাকরী নিয়ে ২৫০ টাকার মাসোহারায় প্রেসিডেন্সীতে সহকারী অধ্যাপকের পদে যোগ দিলেন তিনি। এই বৃটিশ পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নে অনেক পরে, নাগপুরের জাতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর কথায়, "It is not the place or the occasion to enter into a detailed criticism of the educational policy of the government. But I cannot help remarking the apathy and niggardness of the government of India in this respect are lamentable. […] It has well been observed by Mr. Fisher, Minister for Education in England, that 'the capital of a country does not consist in cash or paper, but in the brains and bodies of the people who inhabit it.'[…] I feel it is my duty to take a rapid survey of the future of science in India, and suggest steps which ought to be taken for the proper culture and development of science in India. By this I mean that educated Indians should take a greater part in original investigations, and steps should be taken for the diffusion of scientific knowledge among the rank and file of the people. […] Let us now see where the fault lies. The scientific services of the Government are posts of great value, prospect, and security; they afford to their holders unique opportunities, rare and valuable materials, for study and investigation. But with what studied care the Indians are excluded from these services"…এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি সাজিয়ে দেন পরিসংখ্যান।

শিক্ষকতায় প্রফুল্লচন্দ্র এক ইতিহাস গড়ে তোলেন। ক্লাসের শুরুতে ছোটো-বড় নানান রকম গল্প বলে, ছোটো খাটো পরীক্ষণে, ব্যাখ্যায় তিনি বিষয়গুলোকে করে তোলেন আকর্ষণীয়। ছাত্রদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা হয়ে ওঠে অপরিসীম। অবশ্য শুধু জনপ্রিয়তাতেই থেমে থাকেনি তাঁর অধ্যাপনা। তিনি ছাত্রদের মধ্যে কুঠারাঘাতে ভাঙতে চেয়েছেন কুসংস্কার। তাদের জাগাতে চেয়েছেন নতুন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে, নতুন ভাবে, নতুন মুক্ত মানুষ হিসেবে। তাঁর নিজের কথায়,

"লোকে অনুযোগ করে আমাকে বলেন, যে সারাজীবন টেস্ট টিউব নাড়া-চাড়া করিয়াই তো জীবন কাটাইলেন-কিন্তু এই বয়সে আবার খদ্দর, সংকটত্রাণ, দেশী কলকারখানা স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন, এবং বাঙালী ছেলেদের মাথায় ডাঙ্গশ মারিয়া তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিবার বাতিক চাগাইল কেন?

এই কেনরই আজ উত্তর দিতেছি।

প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল অধ্যাপনার কাজ করিয়া আসিতেছি, এবং সেই উপলক্ষে কত হাজার ছাত্রকে বুঝাইয়া দিয়াছি যে, সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ রাহু নামক কোনো রাক্ষসের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টায় সূর্য ও চন্দ্রকে গলাধঃকরণের চেষ্টায় সংগঠিত হয় না, এবং শেষে মর্ত্যবাসীদের কাঁসর, ঘন্টা, ঝাঁজর এবং খোল করতালের সংযোগে পূজা অর্চনার ফলে রাক্ষসাধিপতি রাহু তৃপ্ত এবং তুষ্ট হইয়া কবলিত চন্দ্রসূর্যকে ছাড়িয়া দেওয়ার ফলেই তাহাদের মুক্তি সংঘটিত হয় না। এই যে সকল জনশ্রুতি ইহা নিছক মিথ্যা এবং কল্পনাপ্রসূত।
পৃথিবী, চন্দ্র এবং সূর্য আপন আপন কক্ষে নিয়ত ঘুরিতেছে। এইরূপ ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িলে এবং চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়িলেই চন্দ্র ও সূর্যের অংশ বিশেষ ঢাকা পড়ে এবং যে পরিমাণ ছায়ায় ঢাকা পড়ে তাহাই আংশিক বা পূর্ণগ্রহণরূপে পৃথিবীতে দেখা যায়। ইহাই চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা,-ইহাদের মধ্যে রাহুর আক্রমণ এবং তাহার মুখগহ্বর হইতে চন্দ্রসূর্যের নিষ্কৃতি ও মুক্তির যে মিথ্যা এবং কাল্পনিক কাহিনী রচিত হইয়াছে তাহা আগাগোড়াই ঝুটা।

আজ অর্ধ শতাব্দীকাল ছাত্রদিগকে এই বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া আসিলাম, তাহারাও বেশ বুঝিল এবং মানিয়া লইল; কিন্তু গ্রহণের দিন যেই ঘরে ঘরে শঙ্খ-ঘন্টা বাজিয়া উঠে এবং খোল-করতাল সহযোগে দলে দলে কীর্তনীয়ারা রাস্তায় মিছিল বাহির করে, অমনি এই সকল সত্যের পূজারীরাও সকল শিক্ষাদীক্ষা জলাঞ্জলি দিয়া দলে ভিড়িতে আরম্ভ করে এবং ঘরে ঘরে অশৌচান্তের মত হাঁড়িকুড়ি ফেলার ধুম

লাগিয়া যায়। সেই হইতে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, যে জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভাবের ঘরে এত লুকোচুরি চলে, তাহাদের মুক্তি সুদূর-পরাহত।"

আর সেই সুদূর-পরাহতকে অর্জন করতে তিনি তাঁর কর্মজীবনের শুরুতে লেখেন "History of Hindu Chemistry" বইটি ১২ বছরের কঠিণ অধ্যবসায়। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, পন্ডিত নবকান্ত কবিভূষণ। সেই লেখায় তিনি অণুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তুলে ধরেন প্রাচীণ ভারতে রসায়ণ চর্চার নৈবর্ক্তিক ইতিহাস। এখানে সমস্যা ছিল একটাই। তৎকালীন সমাজ ছিল বিভক্ত। অনেকে ছিলেন ইংরেজ-মুখী, তাঁরা প্রাচীণ ভারতের সম্বন্ধে ছিলেন চূড়ান্ত নেতিবাচক, উদাসীন। আর অন্যদিকে ছিলেন ঐতিহ্যবাদীরা। তাঁদের কাছে প্রাচীণ ভারত ছিল স্বপ্নময়, অলীক। রামায়ণে পুস্পক বিমানের উল্লেখে তাঁরা খুঁজে নিতেন আজকের বিমানের ব্যবহার, সেই সুপ্রাচীণ সময়ে। তরঙ্গ শব্দের অস্তিত্বের অর্থ ছিল তাঁদের কাছে সেই সময়ে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের প্রচলন ও ব্যবহারের প্রমাণ। আর এমন এক সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র নিঁখুত বিশ্লেষণে দেখান প্রাচীণ ভারতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ আর প্রসার। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি সমালোচনা করেন প্রাচীণ ভারতের বস্তু-জগৎ বর্জিত দার্শণিকতার। বেদান্ত-দর্শণে চিন্তায় অভ্যস্ত ভাবালু ভারতীয় মন কিভাবে আস্তে আস্তে ভাস্করাচার্যের বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান-মনস্কতা ভুলে হারিয়ে ফেলল, প্রাচীণ ধাতুবিদ্যা, শল্য-চিকিৎসা, রসায়ণের উত্তরাধিকার। এর পাশাপাশি এসে মিলল জাতিভেদ, বিশেষ করে বর্ণভেদের প্রভাব। শব-ব্যবচ্ছেদ ছাড়া শল্য-চিকিৎসা শেখা অসম্ভব মনে করতেন সুশ্রুতের মত চিকিৎসাবিজ্ঞানী অথচ, মনু-সংহিতা আর শংকরের বেদান্তের প্রভাবে চিন্তাশীল শ্রেণীর সঙ্গে কর্মশীল শ্রেণীর বিচ্ছেদ হল। বিজ্ঞান সাধনার নিবিড় সাধনা আস্তে আস্তে সরে গেল খন্ডিত ভারত থেকে। শংকরের চোখে পরমাণুর আবিষ্কারক হয়ে ওঠেন কণা-খাদক, বা কণাদ। ভারতবর্ষের মাটি নৈতিকভাবে আর কারণগতভাবে হারায় দেকার্ত, নিউটনকে পাওয়ার এক্তিয়ার। প্রফুল্লচন্দ্রের কথায়, "The caste system was established de novo in a more rigid form. The drift of *Manu* and of the later Puranas is in the direction of glorifying the priestly class, which set up arrogant and outrageous pretensions […]

The arts being thus relegated to the low castes and the professions made hereditary, a certain degree of fineness, delicacy and deftness in manipulation was no doubt secured, but this was done at a terrible cost. The intellectual portion of the community being thus withdrawn from the active participation in the arts, the how and why of the phenomena – the coordination of cause and effect – were lost sight of, and the spirit of enquiry gradually died out among a nation naturally prone to speculation and metaphysical subtleties, and India for once bade adieu to experimental and inductive sciences. Her soil was rendered mortally unfit for the birth of a Boyle, a Descartes or a Newton and her very name was all but expunged from the map of the scientific world." History of Hindu Chemistry বইটি পেয়ে মার্সেলিন বার্থেলট প্রফুল্লচন্দ্রকে লেখা এক শংসাপত্রে লেখেন, "I have received your chemical researches which are highly interesting and I have seen especially with pleasure how science with its universal and impersonal character is equally cultivated by all civilised peoples of Asia as well as Europe and America."

প্রাচীণ হিন্দুধর্মের অবক্ষয়, বৌদ্ধধর্মের অপসারণ থেকে ভারতের বুকে নেমে আসে এক অদ্ভুত আঁধার। শাস্ত্র-সর্বস্বতা থেকে আসে বিজ্ঞানমনস্কতার সামগ্রিক অবনমন। সেই শুরু। আর সেই শুরুর শেষের জন্য আমাদের অপেক্ষা বহুদিনের। ১০০০ অব্দের ভাস্করাচার্য থেকে ১৭৫০ অব্দের রামমোহন রায়ের সময় পর্যন্ত সেই আঁধারের বিস্তার। এরপর আস্তে আস্তে ওঠে আঁধার, বৃটিশ শাসনে আসে প্রাশ্চাত্য শিক্ষার আলো। বেদান্ত দর্শণের ভাবালুতা অতিক্রম করে ভারতবাসীর কাছে আসতে থাকে বস্তুবাদী প্রাকৃত দর্শণের চিন্তা। আসতে থাকেন প্রাশ্চাত্যের মিশনারীরা। যাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য শ্রীরামপুরের মিশনারীরা: ক্যারী, মার্শম্যান আর ওয়ার্ড। প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুস্কুল, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। শুরু হয় বাঙলা তথা ভারতের নব-জাগরণ। তখন উনিশ শতাব্দীর শেষের ভাগ। ভারত তথা বাঙলার তখন মননের সুসময়। প্রফুল্লচন্দ্র ছাড়াও এসেছেন জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, মতিলাল নেহেরু, মদন মোহন মালব্য, মোহনদাস করমচাঁদ

গান্ধী। অঙ্কুরিত সমাজ-চেতনা, বিজ্ঞান-চেতনার মাঝে বাঙলার মাটি হয়ে উঠল জগদীশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, রামন, মেঘনাদের যোগ্য জন্ম-কর্মভূমি। অবশ্য রামমোহন ছাড়াও এর প্রেক্ষাপটে ছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিতের মত ব্যক্তিত্বরা। মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ১৮৭৬ এর ইন্ডিয়্যান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কাল্টিভেশান অফ সায়েন্স আজো ভারতের অন্যতম সেরা মৌলিক গবেষণা কেন্দ্র। ১৮৩৫ এ প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। ১৮৫৭ এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯১৬ এ তারকনাথ পালিতের দেওয়া জমি ও অর্থে প্রতিষ্ঠিত কলেজ অফ সায়েন্স। আর এর পাশাপাশি তেমন করে আস্তে আস্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকল রসায়ণ শিক্ষা। ১৮২১ সালে এডিনবরায় শিক্ষিত জন ম্যাক শ্রীরামপুর কলেজে পড়াতে এসে, ১৮৩৪ সালে প্রথম বাঙলায় রসায়ণের বই লেখেন। ভারতীয় ভাষায় লেখা সেই প্রথম বিজ্ঞানের কোনো বই। মনে পড়ে ও'সঘনেসীর (O'Shaughnessy) কথা। ১৮৪২ সালে তাঁর লেখা Manuals of Chemistry বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এছাড়াও ছিলেন বিখ্যাত ফার্মাকোলজিস্ট ডঃ এফ এন ম্যাকনামারা ও কানাইলাল দে। ৯২ আপার সার্কুলার রোডে যখন রসায়ণে এক নতুন অধ্যয়ের সূচনা করছেন প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক তখনই পদার্থবিদ্যায় আলোড়ন ফেলছেন তাঁর প্রতিবেশী ৯৩ আপার সার্কুলার রোডের বাসিন্দা জগদীশচন্দ্র। তাঁর ১৮৯৫ এর এশিয়াটিক সোসাইটির পেপার এক ভারতে বিজ্ঞানসাধনার এক নতুন যুগের সূচক। তাই প্রফুল্লচন্দ্রকে বুঝতে হলে পাশাপাশি বোঝা প্রয়োজন সেই সময়ের চারপাশের উৎকর্ষের উৎস সন্ধানে উন্মুখ এক রাশ সেরা মেধার মানুষের সমাবেশের কথা। এঁরা একে অন্যের পাশাপাশি থেকে সমৃদ্ধ করেন সেই সময়কে। হয়তো একথা আজ কিছুটা হলেও প্রাসঙ্গিক আজকের বাঙলায়। নতুন তৈরী হওয়া আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষার ইনস্টিটিউট (আই আই এস ই আর), গড়ে উঠতে থাকা জাতীয় স্তরের চিকিৎসা বিজ্ঞান কেন্দ্র, প্রেসীডেন্সী কলেজ ও তার মেন্টর গ্রুপ, এ সবই আজ এই বাঙলায় শুরু করতে পারে সেদিনের মত এক আকর্ষণীয় সময়।

প্রেসিডেন্সীতে আচার্য: ছবিতে রয়েছেন সত্যেন বসু ও মেঘনাদ সাহা।

ফিরে যাওয়া যাক সেই সময়ে। রসায়ণের জগতে তখন এক আকর্ষণীয় সময়। জার্মান বিজ্ঞানী আলফ্রেড ভের্নার আবিষ্কার করেছেন কোর্ডিনেশান কেমিস্ট্রির তত্ত্ব। বিলিয়ার্ড বলের সাযুজ্যে ডাচ বিজ্ঞানী ভ্যান্তোফ তুলে ধরেছেন গ্যাসের চাপের ধর্ম। পাশাপাশি এসেছে জৈব যৌগে কার্বনের চারপাশে অন্যান্য পরমাণুর বিন্যাসের কথা ডাচ বিজ্ঞানী ভ্যান্তোফ ও ফরাসী বিজ্ঞানী ল'বেলের সৌজন্যে। অসংখ্য মৌলের মূল সঙ্গীত প্রতিসমতার সুরে বেঁধে পর্যায় সারণী আবিষ্কার করেছেন রুশ বিজ্ঞানী দিমিত্রি মেন্ডেলিফ। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব জুড়ে চেলেছে নতুন যৌগের খোঁজ। আর সেই খোঁজে বিশ্বমানের অবদান প্রফুল্লচন্দ্রের। তাঁর কাজকে মোটামুটি ছটা প্রধান অনুষঙ্গে ভাগ করা যায়। যেমন,

১) নাইট্রাইট সংক্রান্ত কাজ। বিশেষতঃ মারকিউরাস নাইট্রাইট নিয়ে তাঁর কাজ;

২) অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট এবং ঐ জাতীয় যৌগ;

৩) সালফার জাতীয় যৌগ;

৪) কোর্ডিনেশান যৌগ;

৫) জৈব যৌগের ফ্লোরিনেশান;

৬) দেশী খাবারের ফ্যাট জাতীয় উপাদান বিশ্লেষণ।

নতুন যৌগের খোঁজে প্রফুল্লচন্দ্র পারদকে মৌল হিসেবে বেছে নেন। এই বেছে নেওয়ার পেছনে হয়তো ছিল আয়ুর্বেদে তথা প্রাচীণ ভারতীয় ওষুধে পারদের বহুল ব্যবহার। একটু উঁকি মারা যাক রসায়ণের আরেকটু গভীরে। পারদ মৌলের পরমাণুগুলো এক বিশেষ ইলেক্ট্রণ বিন্যাসে থেকে থাকে। ইলেক্ট্রণ হল ঋণাত্মক তড়িৎবাহী এক অন্যতম মৌলিক কণা, যা পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত নিউক্লিয়াসের চারপাশে বিভিন্ন কক্ষে ঘুরতে থাকে। যেমন করে মেঘলা দিনে সূর্যের তেজ আমাদের বিব্রত করে না ঠিক তেমন করেই বিশেষ বিন্যাসের ইলেক্ট্রণের মেঘ বাইরের ইলেক্ট্রণের মেঘকে কেন্দ্রের ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত নিউক্লিয়াসের আকর্ষণের তেজ থেকে মুক্ত রাখে। যখন একদম বাইরের কক্ষের ইলেক্ট্রণের মেঘ সম্পূর্ণ ভাবে নিউক্লিয়াসের আকর্ষণকে প্রশমিত করে তখন সেই পরমাণু হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয়, গ্যাসীয়। উদাহরণ, হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গণ, ক্রিপ্টন, জেনন, রেডন। এখন পারদের পরমাণুর ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রণের বিন্যাস এমনিই যে, তার থেকে ২ টো ইলেক্ট্রণ বেরিয়ে গেলে তার অবস্থা হয় ওই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মত। স্থায়ী। ধীর। নিষ্ক্রিয়। রসায়ণের পরিভাষায় এই অবস্থার নাম মারকিউরিক। তাই পারদ খুব সহজেই মারকিউরিক অবস্থায় যেতে চায়। তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে, এই অবস্থায় পারদের ইলেক্ট্রণ বিন্যাস সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মত না হলেও অনেকটা ছদ্মবেশী নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মত। তাই বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই ইলেক্ট্রণ বিন্যাসকে বলা হয়, Pseudo inert gas configuration। অথচ, পারদের থেকে একটা ইলেক্ট্রণ বেরিয়ে গেলে সে আরো একটা ইলেক্ট্রণ হারিয়ে ছদ্মবেশী নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মত হতে চায়। তাই এক ইলেক্ট্রন হারিয়ে পারদের যে অবস্থা হয়, অত্যন্ত অস্থায়ী। রসায়ণের পরিভাষায় এই অবস্থার নাম

মারকিউরাস। অন্যদিকে নাইট্রাইট হল এক ধরণের পরমাণুর বিন্যাস যা বিস্ফোরক রকমের বিক্রিয়ক বলে ধারণা ছিল তখন। তাই সেই সময় মারকিউরাস নাইট্রাইট যে আদৌ, তৈরী করা তো দূরের কথা, থাকতে পারে তাই জানা ছিল না। আর এখানেই প্রফুল্লচন্দ্রের কাজের মাহাত্ম্য। তিনি সুন্দর পরীক্ষণের সাহায্যে দেখান, যে মারকিউরাস নাইট্রাইট তৈরী করা সম্ভব। আর এই আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে আলোড়ণ ফেলে দেয়। শুরু হয় প্রফুল্লচন্দ্রের জীবণে এক নতুন অধ্যয়। তাঁর নিজের কথায়, “the discovery of mercurous nitrite opened a new chapter in my life.” তাঁর এই কাজের কথা উঠে এল বিজ্ঞানের অন্যতম জনপ্রিয় জার্নাল, নেচারে, ১৮৯৬ সালে। ”The Journal of Asiatic Society can scarcely be said to have a place in our libraries; the current number, however, contains a paper by Dr. P. C. Ray of the Presidency College, Calcutta on mercurous nitrite that is worthy to note. During a preparation of mercurous nitrate by the action of nitric acid (dilute) in the cold on mercury, yellow crystals are deposited, which upon examination, proved to be mercurous nitrite.”

তবে এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। এরপর তিনি তৈরী করলেন মারকিউরাস হাইপোনাইট্রাইট ও মারকিউরিক হাইপোনাইট্রাইট। তাঁর এই আবিষ্কারের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হল নেচারে। সেখানে তিনি লিখলেন, “It has been shown elsewhere that mercurous nitrite, on prolonged contact with a large bulk of water, partially dissociates into mercury and mercuric nitrite […] We have thus a neutral solution containing both mercurous and mercuric nitrite. It thus occurred to me that, if this solution were treated according to the method of Divers, the discoverer of hyponitrites, it might be possible to obtain the corresponding mercury compounds.”

তখন অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট নিয়েও প্রচলিত ছিল একধরণের ভুল ধারণা। মনে করা হত যে যৌগটা সহজে ভেঙে গিয়ে তৈরী হয় নাইট্রোজেন ও জল। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আর সিলভার নাইট্রাইটের সাহায্যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট শুধু তৈরীই করলেন না, তার কম চাপ ও তাপমাত্রায় তার

উর্ধপাতনে ক্রিস্টাল বানালেন এবং যৌগটি যে বেশ কিছু উঁচু তাপমাত্রায় উদ্বায়ী (৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) তাও পরীক্ষামূলকভাবে দেখালেন। এই পরীক্ষার রেসাল্টের ভূয়সী প্রশংসা করেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী র‍্যামসে। ১৯১২ সালে নেচার পত্রিকাতেও এই পরীক্ষার ফলাফল উল্লিখিত হয়। ১৯০০ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী তৈরী করেন ম্যাগনেশিয়াম ভিত্তিক যৌগ যার থেকে সহজে জলের সাহায্যে মিথেনের মত জৈব গ্যাস তৈরী করা যায়। এর জন্য তিনি ১৯১২ সালে পান নোবেল পুরস্কার। প্রফুল্লচন্দ্রও সেই রকমের পারদভিত্তিক যৌগ তৈরী করেন, যাদের রসায়ণে পোশাকী নাম মারকারী অ্যাল্কিল অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট।

এছাড়াও বিশেষভাবে উল্লেখ্য তাঁর তৈরী করা উচ্চ আণবিক গুরুত্বের গন্ধক ভিত্তিক যৌগ, গন্ধক সমন্বিত কর্পূর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গন্ধক সমন্বিত লিগ্যান্ডের ব্যবহার করে আর তাদের সাহায্যে তৈরী করেন সোনা, প্ল্যাটিনাম, ইরিডিয়াম ভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের কোর্ডিনেশান যৌগ। [এখানে বলে রাখা ভালো লিগ্যান্ড এক ধরণের অণু বা আয়ন বা তাদের সম্মিলন যা সোনা, প্ল্যাটিনামের মত ধাতুর সঙ্গে জুড়ে কোর্ডিনেশান যৌগ নামের এক ধরণের যৌগ তৈরী করে।] তখন আরেক আকর্ষণীয় কাজ ছিল জৈব যৌগের ফ্লোরিনেশান। প্রফুল্লচন্দ্র থ্যালাস ফ্লুওরাইড ব্যবহার করে খুব সুন্দরভাবে তৈরী করেন মোনোফ্লুরো অ্যাসিটোন। এছাড়াও ভেজাল প্রতিরোধে তিনি দেশী খাবারের ফ্যাট জাতীয় উপাদান বিশ্লেষণেও বিশেষ কাজ করেন।

“In Europe industry and scientific pursuits have gone hand in hand […] one helping the other […] the gigantic progress in industry achieved in Europe and America is a history of the triumph of researches in the laboratory […] These thoughts were weighing heavy on me at the very threshold of my career at Presidency College. How to utilize utilize thousand and one raw products which Nature in her bounty has scattered in Bengal? How to bring bread to the mouths of the ill fed […]” সেই ভাবনার হাত ধরে ১৯০২ সালে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর নিজের আপার সার্কউলার রোডের বাড়ি থেকে তিনি শুরু করেন বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। প্রতিষ্ঠানটির মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি

নিজের ব্যাগে ছোটো ছোটো শিশি বোতলে প্রতিষ্ঠানটির প্রডাক্ট নিয়ে অক্লান্তে ঘুরে বেরিয়েছেন শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। আস্তে আস্তে সাফল্য অঙ্কুরিত হয়। বেঙ্গল কেমিক্যাল হয়ে ওঠে লিমিটেড লায়াবেলিটি কোম্পানী। প্রফুল্লচন্দ্রের বাড়ী থেকে কর্ম কান্ড উঠে আসে মানিকতলায়। যোগ হয় পানিহাটির ফ্যাক্টরী। আস্তে আস্তে যোগ দেন ডঃ অমূল্যচরণ বসু, ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, কূলভূষণ ভাদুরী প্রমুখ। ধীরে ধীরে প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গল কেমিক্যাল হয়ে ওঠে দেশের অন্যতম ওষুধ ও রাসায়ণিক শিল্প কেন্দ্র। কিন্তু বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টর হিসেবে একটা পয়সাও নিতেন না প্রফুল্লচন্দ্র। সব যেত দান বা ত্রানে। তাঁর মনে ছিল শিল্পে জাতির মুক্তি ভাবনা, নারী মুক্তির স্বপ্ন। আর হয়তো সেই স্বপ্ন নিয়েই বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টর হিসেবে এনেছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু ডঃ অমূল্যচরণ বসুর বিধবা পত্নীকে। সেসময়ের সে এক বিরল দৃষ্টান্ত। শিল্পে জাতির মুক্তি ভাবনায় তিনি আরো তৈরী করেন কলকাতা পটারী ওয়ার্কস, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস, ন্যাশনাল ট্যানারী ওয়ার্কস, প্রভৃতি।

বেঙ্গল কেমিক্যাল ল্যাবোরেটারিতে আচার্য।

"Science can wait, swaraj cannot." প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত না থাকলেও তাঁর দর্শণে জড়িয়ে ছিল কর্মময় দেশপ্রেম। তার কেন্দ্রে ছিল মানুষ। দেশের মানুষ। তাই যখনই এসেছে দুর্ভোগ, বন্যা, দুর্দশা, তখনই তিনি টেস্টটইউব ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন দেশের দুর্গত মানুষের ত্রাণে। ১৯২১ এর খুলনার বন্যায় তিনি খুলনা ত্রাণ কমিটি গঠণ করে দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ১৯২২ এর উত্তর-বঙ্গের বন্যায় তিনি নেতৃত্ব দেন বেঙ্গল রিলিফ কমিটির। এসময় তাঁর পাশে দাঁড়ান মেঘনাদ সাহাও। তাঁরা আড়াই লক্ষ টাকার ত্রাণ সরাসরি পৌঁছে দেন আর্ত মানুষের কাছে। ম্যান্চেস্টার গার্জেনে লেখা হয় সেই খবর, সমালোচিত হয় সরকারী ব্যর্থতা।

"In these circumstances, a professor of Chemistry, Sir P. C. Ray, stepped forward and called upon his country men to make good the Government's omission. His call was answered with enthusiasm. The public of Bengal, in one month gave three lakhs of rupees." এমনকি ১৯৩১ সালে আবার উত্তর-বঙ্গের বন্যায় সত্তর বছরের প্রফুল্লচন্দ্র গঠণ করেন সংকট ত্রাণ সমিতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে পরিচালিত হয় সমস্ত ত্রাণ কাজ। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, এই কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে থাকায় এতই মুগ্ধ হন মেঘনাদ সাহা যে পরে বেশ কিছু সময় তিনি নিজেকে নিযুক্ত রাখেন দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশানের পরিকল্পনায় ও রূপায়ণে। আর এসবের পাশাপাশি ছিল তাঁর সহজ সাজপোশাক, নিড়ারম্বর জীবন-যাপণ।

প্রফুল্লচন্দ্রের সাথে মহাত্মা।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে মহাত্মা গান্ধীর এক কথা, “It is difficult to believe that the man in simple Indian dress wearing simple manners could possibly be the great scientist and professor.”

আজ সার্ধশতবর্ষে তাই ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে প্রফুল্লচন্দ্রের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার। আমরা যারা আজ ভারতে রসায়ণচর্চায় নিরত একভাবে আমরা সকলেই তাঁর কাছে ঋণী। তিনি অধুনিক ভারতে রসায়ণচর্চার জনক। আর তিনিই প্রথম পাশ্চাত্যের ধাঁচে গড়ে তোলেন ভারতে রসায়ণের স্কুল। তাঁর ছাত্ররা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়েন দেশের একোণ থেকে ওকোণে। গড়ে তোলেন তাঁর আদর্শে প্রাণিত রসায়ণচর্চার কেন্দ্রগুলো। মনে ভিড় করে অনেকের নাম, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের নাম, যিনি প্রথমে আই আই এস সি, বাঙ্গালোর এবং পরে আই আই টি, খড়গপুরের প্রতিষ্ঠাতা নির্দেশকের ভূমিকায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থার রূপায়ণে এক অনন্য ভূমিকা নেন। মনে পড়ে শান্তিস্বরূপ ভাটনাগরের কথা, যিনি ছিলেন অতুলচন্দ্র ঘোষের ছাত্র, আর অতুলবাবু ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র। তিনি রেখে গেছেন ভারতীয় কেমিক্যাল সোসাইটি, আর তার গবেষণা পত্রিকা, ইন্ডিয়্যান জার্নাল অফ কেমিস্ট্রি। আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ণ বিভাগ, যেখানে তিনি রেখে যান তাঁর উপার্জনের প্রায় দুলক্ষ টাকা, অনুদান স্বরূপ। আর তাঁর অনুদানে রেখে যাওয়া নাগার্জুন পুরস্কার। তবে এসব কিছুর ওপর সত্যি হয়তো তাঁর রেখে যাওয়া ছাত্রদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, যে ভালোবাসায় তিনি বলতেন, ‘ওরা হলো কুমোরের চাকে চড়ানো নতুন কাদামাটি, কুমোর যেমন ইচ্ছে কীর্তি ওদের দিয়ে তৈরী করতে পারে।‘ আচার্যের সার্ধশতবর্ষে আজ নতজানু হয়ে তাঁর স্বপ্নে ভেসে আসে এক ছোট্ট প্রার্থনা।

“এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূণ্য হাত -
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।”

তথ্যসূত্র:

1. A. Bhattacharya (Ed.) *Research Papers of Acharya Prafulla Chandra Roy: A Complete Collection,* Kabi Sukanta Housing Co-operative: Printer & Distributor, Deep. Prakashan, Kolkata, India (2006).

2. S. Chakravorty (Ed.), *Praphulla Chandra Ray: A Checklist of Majot Holdings in English and Bengali,* National Library Kolkata, India (2011).

3. Prafulla Chandra Ray, *Dawn of Science in Modern India,* Proceedings of Indian Science Congress, Nagpur, India (1920).

4. J. L. Simonsen, *Obituaries: Sir Prafulla Chandra Ray, Nature*, 154 (1944) 76.

5. A. Chakravorty, *Prafulla Chandra Ray*, *Resonance*, January (2001) 3.

6. S. Banerjee, *Acharya Prafulla Chandra Ray: An epitome of scientific attitude and human values, Breakthrough,* 15 (2011) 12.

7. S. Goswami, S. Bhattacharya, *Chemical Research of Sir Prafulla Chandra Ray, Resonance,* January (2001) 42.

8. S. Chakrabarti, *Acharya Prafullachandra Ray: Life of a Legend, Propagation, ncsm.gov.in/science_pdf/**Propagation**%20Vol%202%20Contents.pdf*

9. G. Mukherjee, *Acharya Prafulla Chandra Ray at the College of Science, Resonance,* January (2001) 50.

10. *Special Issue on Prafulla Chandra Ray, Prakriti,* January (2011).

11. A. Basu, *Chemical Research in India during Nineteenth Century, Indian Journal of History of Science,* 24 (1989) 318.

12. S. B. Roy, S. K. Sen, *Scientific research papers by native Bengali authors during the nineteenth century, Current Science* 99 (2010) 1849.

* লেখাটি ইন্ডিয়্যান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কাল্টিভেশান অফ সায়েন্সের অধ্যাপক অনিমেষ চক্রবর্তীকে উৎসর্গ করা হল। লেখাটিতে তথ্যসংগ্রহে সাহায্যের জন্য আই আই এস ই আর কলকাতা গ্রন্থাগারের শিলাদিত্য জানার অবদান বিশেষ উল্লেখ্য। লেখাটি ১৯ শে আগস্ট কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে দেওয়া আমন্ত্রিত বক্তৃতার ভিত্তিতে। লেখক আই আই এস ই আর কলকাতার রসায়ণবিভাগের সহকারী অধ্যাপক।